গোচারণের মাঠ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

প্রণীত।

চুঁচুড়া।

সাধারণী যন্ত্রালয়ে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৭।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই 'গোচারণের মাঠ' পড়িয়া আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা ভূমিকা স্বরূপ প্রকাশ করিলাম, ইহাতে আর কিছু না হয়, আমার আশার এবং আক্ষেপের কথা ব্যক্ত করিবে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

তোমার গোচারণের মাঠ পড়িয়াছি। ২৪ পৃষ্ঠা কাব্য খানির মধ্যে একটিও যুক্তাক্ষর নাই;—বাঙ্গালা ভাষা তোমার আজ্ঞাধীন, যদি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়া থাক, তবে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

তোমার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, যুক্ত অক্ষর ছাড়িয়া দেওয়াতে একটা বড় সুফল ফলিয়াছে। অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য খানি লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দে যুক্ত অক্ষর আছে, সে গুলি প্রায় সংস্কৃত মূলক। অতএব যুক্ত-অক্ষর পরিত্যাগ করিলে কাজে কাজেই কট মট, সংস্কৃতবহুল ভাষাও পরিত্যক্ত হয়; যে সরল বাঙ্গালায় লোকে কথা বার্ত্তা কয়, সেই ভাষা আসিয়া পড়ে। ভাষা সম্বন্ধে ইহা সামান্য লাভ নহে। যত দিন না প্রচলিত বাঙ্গালায় বহি লেখার পদ্ধতি চলিত হয়, তত দিন সাধারণ লোকে বহি পড়িবে না; সাধারণ লোকে বহি না পড়িলে, লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে না, আর ভাষারও প্রকৃত পুষ্টিলাভ হইবে না।

এমন কথা বলি না, যে প্রচলিত বাঙ্গালায় যুক্ত-অক্ষর নাই; বা যুক্ত অক্ষর বিরল। যুক্ত-অক্ষর ছাড়িয়া দিলে, এমন কি অধিক ক্ষণ কথা বার্ত্তা চলে না। তবে চলিত বাঙ্গালায় যুক্ত-অক্ষর কম, কেতাবি বাঙ্গালায় বেশী। তুমি দেখাইয়াছ, যে যুক্ত-অক্ষর একেবারে ছাড়িয়া দিয়াও ভাল ভাষায় ভাল কাব্য লেখা যায়।

যুক্ত-অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া কবিতা লেখা, এই প্রথম নহে, তাহা আমি জানি; "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—প্রভৃতি সকলেরই মনে আছে, আর তার পরও কোন কোন লেখক অসংযুক্ত বর্ণে কবিতা লিখিয়াছেন, এমনও স্মরণ হইতেছে। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে তুলনায় "গোচারণের মাঠের" একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সে গুলি ছন্দোবিশিষ্ট হইলেও, কবিতা নহে।—কবিত্ব সেগুলিতে প্রায় নাই। যে সকল শিশুরা যুক্ত অক্ষর ভাল পড়িতে পারে না, তাহাদিগের কাব্য পাঠের জন্যই সে গুলি লেখা হইয়াছে। কিন্তু ছেলেদের কবিত্ব-হীন কাব্য পড়াইয়া কোন লাভ আছে কি না—আমার সন্দেহ। লোকের বিশ্বাস আছে যে ছন্দ ও মিল বিশিষ্ট রচনায় ছেলেদের মন হরণ করে, সেই জন্য গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে ছেলেরা ভাল বাসিতে পারে। কিন্তু ফলে কি তাই? আমিত কোন শিক্ষকের মুখে শুনি নাই যে ছেলেরা গদ্যপাঠ অপেক্ষায় পদ্যপাঠে অধিক মনোযোগী হয়। বোধ হয়, যত দিন ছেলেরা পাঠ্য পদ্যে কর্কশ উপদেশ, আর নীরস বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই

পদ্যে কর্কশ উপদেশ, আর নীরস বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না, তত দিন গদ্যে পদ্যে তাহাদের সমান আদর বা অনাদর থাকিবে। ফলে, কবিত্ব-শূন্য কাব্য ছেলেদের পড়ান বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যালয়ে কাব্য গ্রন্থ পড়াইবার উদ্দেশ্য কি? সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে কাব্যে ভাষা শিক্ষা ভাল হয়। পোপের প্রাচীন কথার দ্বারা অনেকে এ সংস্কার সমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। বিদেশীয় ভাষার পক্ষে ইহা সত্য হইলে হইতে পারে, দেশীয় ভাষার পক্ষে তত সত্য কি না,—আমার সন্দেহ। বালককে কাব্য পড়াইবার এক মাত্র উদ্দেশ্য—আমি স্বীকার করি—কাব্যের উন্নত ভাবের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। ইহা কেবল পদ্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় না—কবিত্বের প্রয়োজন। তোমার এই "গোচারণের মাঠ" অতি সরল ভাষায় লিখিত হইলেও, কবিত্ব-পূর্ণ। অনেক স্থানে উচু দরের কবিত্ব ইহাতে দেখিয়াছি। ছেলেদের যদি কাব্য পড়াইতে হয়, তবে এই খানিই তাহার উপযোগী। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা যে এ দেশের পাঠশাল স্কুলে চলিবে এমন ভরসা আমি করি না। যদি চলে তবে আমি বিস্মিত হইব। যাহা চলিবার যোগ্য তাহা চলিবে, শিক্ষা বিভাগের এমন নিয়ম নহে। শিক্ষা বিভাগে কেন, যাহা চলিবার যোগ্য তাহা তুমি কোথায় চলিতে দেখিয়াছ?

চুঁচুড়া
২২শে বৈশাখ ১২৮৭

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গোচারণের মাঠ।

অমল শামল তৃণ ঢাকা ধরাতল,
বহু দূর ভরপূর সবুজ কেবল ;
অতিদূরে সমুখেতে রহিয়াছে কত,
থাক্ থাক্, কাল কাল, ধোঁয়া ধোঁয়া মত,
ছোট ছোট শৈল-মালা আকাশের গায়,
নিবিড় মেঘের মত বেশ দেখা যায়।
বামেতে আকাশ আসি পরশিছে মাটী,
হরিতে মিলেছে নীল অতি পরিপাটী ;
উপরে আকাশ-পট কেমন সুনীল,
সাঁই সাঁই পাখা ছাড়ি ভেসে যায় চীল।
পিছনে বসতি ঘর, বাগান, সরাই,
পোঁতা উচা চালা ঘর, পালুই, মরাই।
সুগভীর সরোবরে ঢাকিয়াছে জল,
কমলের পাতা আর কলমীর দল ;

মাথায় বটের চূড়া সেকেলে দেউল,
আশে পাশে অনাদরে পুরাণ তেঁতুল ;
বেউড় বাঁশের ঝাড় মাথা নোয়াইয়া,
কট্ কট্ রব করে থাকিয়া থাকিয়া।
নিকটে বিটপী বট নিবিড়, অসাড়,
পট হয়ে বসে যেন গাছের পাহাড়।
অতিশয় উঁচু পাড়ে তিন সারি তাল,
আধ ভাঙা বাঁধা ঘাট, চৌচীর চাতাল।
ডাহিনে গহন বন—নীরব, বিশাল,
এক পদে যোগ সাধে কত শত শাল ;
পাছে কেহ গোল করে, এই ভয়ে তারা,
সারি সারি তাল-তরু রেখেছে পাহারা।
যোগ সাধনের কাল রাত্তি পোহাইল,
সোণার দুয়ার খুলি ঊষা দেখা দিল ;
পবন বলিল মৃদু সবাকার কাছে,
ঊষা দেখা দিল আর, ঘুমাতে কি আছে ?
যোগীদের পাহারায় তাল আছে খাড়া,
দেহ ঝাড়ি, মাথা নাড়ি, দিল তারা সাড়া ;
তালপাতা অসি তুলি ঝনাৎ করিল,
সেই রবে শাখীদের সমাধি ভাঙিল।

মাথা তুলি, চোখ মেলি, চৌদিকে চাহিল,
কুসুম কুমারী ঊষা নয়নে হেরিল;
লাজ পেয়ে ধীরি ধীরি শিরে দিল তাজ,
হীরা মরকত তাহে মুকুতার কাজ;
তাজ পরি সমাদরে মাথা নোয়াইল,
লোহিত কপোলে ঊষা ঈষৎ হাসিল।
ঊষাপতি হাসে তাহে ঊষার আদরে,
উজলে অরুণ আঁখি নব-রাগ ভরে;
সে হৈম হাসিতে বন ভাসিয়া উঠিল,
শামল সবুজে হাসি গড়ায়ে চলিল।
আকাশের হাসি গিয়া মিশিল আকাশে,
সুনীল আকাশে হাসি আপনিই হাসে।
জগতে জাগাতে গতি করিল সমীর,
ঈষৎ কুপিত তবু অতীব সুধীর;
দুলালী লতারে ধরি ধীরে দুলাইল,
পাতার ভিতর হতে ফুল দেখা দিল।
তরুরে তাড়না করি যায় বায়ু চলি,
শাখীর কোলেতে পাখী করিল কাকলি।
চলিল কাকের সারি পাখা দুলাইয়া,
আগেতে বসিল আসি বাঁশঝাড়ে গিয়া,

মহাশোর গোল করি তথা হতে উড়ে
বসিল চালের পরে, মরায়ের চূড়ে ;
সারকুড়ে পড়ে গেল অতিশয় ধূম,
কাকারবে কৃষকের ভাঙাইল ঘুম ;
পিঁড়িতে ননদী উঠি বিছানা তুলিল,
দুয়ার খুলিয়া বধূ বাহির হইল।
দুহাতে দুগাছি কড় গায়ের গহনা,
নাহি বেশ, রুখু কেশ, মলিন বসনা ;
কপালে সীঁদুর হেরি মনে লয় হেন,
শীত ঋতু রাতি শেষে শুকতারা যেন ;
সতীভাব, সরলতা ভাসাল নয়নে,
অশোক বনের সীতা কৃষক ভবনে।
কাঁখেতে কলসী লয়ে চলে ধীরে ধীরে,
চুপে চুপে নামে বালা সরোবর তীরে,
কে যেন কাহার কথা কাণেতে বলিল,
সমবয়সীরে হেরি সলাজ হাসিল।
চোখ মুছে, মুখ ধুয়ে উঠে জল লয়ে,
বাঁকা হয়ে গুটি গুটি চলিল আলয়ে।
উঠেছে কৃষক ভায়া হুঁকা ধরিয়াছে,
তার সনে কার এবে তুলনা বা আছে ?

রাখাল গোপাল-লয়ে গোচারণে যায়,
হাতেতে পাঁচনবাড়ি, টোকাটি মাথায়,
মালকোঁচা কটিতটে, কোঁচড়েতে চা'ল
'ধেই ধেই' করি গোরু করিছে সামাল।
পুকুরের পাড় ছাড়ি ধরিল জাঙাল,
বটতলা পিছে ফেলি চলিল গোপাল।
রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বটতরু ঘিরে,
গোচারণ মাঠে গাভী চরে ধীরে ধীরে;
অমল শামল ঘাসে ঢাকা ধরাতল,
বহুদূর ভরপূর সবুজ কেবল।

২।

রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বট তরু ঘিরে,
গোচারণ মাঠে গাভী চলে ধীরে ধীরে;
তিন, চারি, পাঁচ, ছয়,—দলে দলে চলে,
মচ মচ করি ঘাস ছিঁড়য়ে চুকলে;
শামলী ধবলী রাঙী কেমন দেখায়,
খুটি খুঁটি ঘাস খায়, গুটি গুটি যায়;
এক পা দুই পা যায়, মাছী লাগে গায়,
শিঙ্ ঝাড়ে, মাথা নাড়ে, লাঙুল দোলায়;

তড়িত চালনা মত শরীর কাঁপায়,
বসিতে না পারে মাছী উড়িয়া বেড়ায় ;
ডাহিনে বামেতে ফিরে, সোজা নাহি চলে,
নতুন নতুন ঘাস খায় দুই কলে।
কুটি কাটি নাহি মাঠে. অতি নিরমল,
নীহারে ভিজান তৃণ, সুচারু শামল,
কাঁথার মতন পুরু, কেমন কোমল,
তুলার তোষকে যেন ঢাকা মখমল ;
তরুণ তপন আভা খেলে তদুপরি,
চক্ চক্ করে মাঠ যে দিকে নেহারি।
দেখিতে দেখিতে রবি গগনে উঠিল,
দেখিতে দেখিতে মাঠ ঝকিতে লাগিল।
রাখাল দাঁড়ায়ে ছিল বটতলা ঘিরে,
হাতেতে পাঁচন বাড়ী, টোকা বাঁধা শিরে ;
দেখিতে আছিল সেই আপনার মনে,
ভোরের ভানুর ছটা বিভোর নয়নে ;
পলকে পলকে রবি থকে থকে উঠে,
ঝলকে ঝলকে বিভা চারি দিকে ছুটে ;
চাহিতে চাহিতে তার চমক হইল,
এ উহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল ;

বটের শিকড়ে রাখি টোকা আর বাড়ী
দোল খাইবারে সবে করে তাড়াতাড়ি ;
যে যার দোলনা চাপি খাইতেছে দোল,
পায়ে পায়ে ঠেলাঠেলি, বুকে বুকে কোল ;
কালু মাথে টুসি দিয়া দুলেছে কানাই,
ফিরিবার কালে কালু তারে ছাড়ে নাই।
জটির জটার গেরো গিয়াছে খুলিয়া
এক জটা এক হাতে রহিল ঝুলিয়া,
তল দেশে তটিরাম করয়ে বিহার ;
তটির কাঁধেতে জটি হৈল সওয়ার।
করতালি দিল যারা ছিল তল-দেশে,
দোলনায় ছিল যারা উঠে সব হেসে ;
চট চটি করতালি, খল খল রোল,
দমকে দোলনা পরি দিল তাহে দোল।
বড় বড় বট শাখা দুলিতে লাগিল,
থমকি থমকি পাতা সিহরি উঠিল।
সুবাস বহিল বায়ু সুধীর লহরী,
ছায়িল শাখীর গায়ে সর সর করি ;
সরোবরে তরতর করে নীল জল ;
কাঁপিল কমল-পাতা, কলমীর দল ;

পুরাণ তেঁতুলে, দেখি, শোয়াস বহিল ;
সুগোল বকুল তরু মাথা দোলাইল।
দৈয়াল দুইটি ছিল বকুলের ডালে,
জিলেতে মিলায়ে তান তুলে এক কালে ;
কাণেতে পশিলে সুর চোখে আসে জল ;
এলাইয়া যায় গিরা দেহের সকল ;
কিছুতে না রহে মন, শরীরেতে বল;
হিয়ায় বিঁধিয়া করে পরাণ বিকল ;
শরীরে শোণিত গতি হয় ধীরে ধীরে,
ঝিঁঝি ঝিঁঝিঁ করি সুর বাজে শিরে শিরে।
জিলের উপরে জিল তুলিল দৈয়াল,
ঝিঁঝিঁল বটের তল, থামিল রাখাল ;
বট জটা ধরি সবে অবশে ঢুলিল,
তলে যারা ছিল তারা এলায়ে পড়িল ;
গোকুলে চাহিয়া রহে, বকুলেতে কাণ,
গাভীতে মজিল আঁখি, পাখীতে পরাণ।
গোপের বিলাস বাস সেই বট তল,
উপরে চাঁদোয়া তার করে ঝল মল,
রাখালের মখমল সেই তৃণ দল,
টানা পাখা দোলে পাতা তাহে অবিরল,

সম্মুখে সুচারু ছবি   মাঠেতে গোপাল,
রাখালের কালোয়াত   বকুলে দৈয়াল।
বিলাস বিভোরে তার   হৃদয় ভরিল,
মেঠো সুরে রাখালেরা   গান জুড়ে দিল;
গগন পরশী গলা,   তীখন, রসাল,
নীরবে বিটপী পরে   শুনিছে দৈয়াল;
দূরে গাভী তৃণ মুখে   ফিরিয়া চাহিল,
কাল কাল ভাসা চোখ   ঝামরি আসিল;
কৃষকের বধূগণ   কাঁখেতে কলসী
দলে দলে আসে সবে   ডাকিয়া পড়সী;
তটি জটি কালু কানু   গাইতেছে গান,
সুবল যুগল তাহে   ধরিতেছে তান;—

গান।

"আকাশের কোলে অই—নব জলধর,—
কেমন নয়ন ভরা   রূপ মনোহর,—
তোরা যাবি ওর কাছে?   যাবি যদি আয়,—
আঁকা বাঁকা দেহখানি   অই দেখা যায়;
কাছে গেলে জলধর   দিবে জল ধার,
তৃষিত তাপিত হিয়া   জুড়াবে সবার;

কত রামধনু সবে দিবে হাতে হাতে,
তোরা যাবি যদি আয়, আমাদের সাথে ;
আকাশের কোলে অই নব জলধর,—
কেমন নয়ন ভরা রূপ মনোহর ;—"

গাহিতে গাহিতে তারা টোকা বাঁধে শিরে,
বেণু বাড়ী হাতে লয়ে কটি বাঁধে ধীরে।
হললা বলিয়া সবে সবুজে ঝাঁপিল,
নব জলধর পানে দৌড়িতে লাগিল ;
আকাশের কোলে সেই নব-জলধর,
আঁকা বাঁকা দেহখানি রূপ মনোহর।
মাঝ মাঠে গিয়া হাঁপ ছাড়িল রাখাল,
আশে পাশে ছিল গোরু, করিল সামাল ;
তাড়াইয়া গাভীগণ চলিল সকলে,
দাঁড়াইল গিয়া সবে পাহাড়ির তলে ;
কত রামধনু সেথা খেলে ফুয়ারায়,
শৈল খাদে পড়ি জল, উপচিয়া যায় ;
তৃষাতুর কাল গাভী, ধবল বাছুর,
পিয়ায়ে শীতল জল, ধুয়ে দিল খুর ;

পাহাড়ির ঢালু গায়ে চরে গাভী পাল ;
ছাতিমের ছায়া দেখি বসিল রাখাল।

৩।

ভাজা চাল, ভিজা ছোলা—মুটি মুটি খায়,
আপনার গাভী পানে নয়ন হেলায়।
শামলী ধবলী গাভী কেমন দেখায়,
খুঁটি খুঁটি ঘাস খায় গুটি গুটি যায়।
বড় বড় ঝিঁঝিঁগুলা মাথার উপরে,
ঝাঁকে ঝাঁকে অবিরত ঝল ঝল করে,
হলুদ মাথান পাখা অতি সে চিকণ,
কাল কাল আঁজি তায়, শিরের মতন ;
উলটি পালটি যায়, ফর ফর করি,
মুখে মুখ দিয়া যায় বহু দূরে সরি ;
পাখায় পাখায় লাগে লাফাইয়া উঠে,
তীর বেগে এক দিকে চলি যায় ছুটে,
থক থক করি ফিরে থামা দিতে দিতে ;
চরকির মত কভু লাগয়ে ঘুরিতে।
আতসে মাতয়ে ঝিঁঝিঁ, খেলায় বাতাসে ;
পাতলা পাতলা ছায়া ভেসে যায় ঘাসে।

উড়িতে উড়িতে ঝিঁঝিঁ বিরামের তরে,
গা-ভাসান দিয়া সব দাঁড়ায় নিথরে,—
নীল চাঁদোয়ায় যেন পাখী আঁকিয়াছে,
জোড়া জোড়া পাখা কেন? ভুল করিয়াছে!
ভুল নয়! ভুল নয়! আঁকে নাই কেহ,
আকাশের গায়ে অই ফড়িঙের দেহ,
ঈষৎ বাতাস আসে ঝর ঝর করে,'
থক থক ঝল ঝল ঝিঁঝিঁ যায় সরে।

ছুটি ছুটি জলপান মুটি মুটি গণে,—
রাখাল চিবাতেছিল আপনার মনে,
আপনার গাভী পানে পুন পুন চায়,
গাভী পিঠে ঝিঁঝিঁ ছায়া উড়িয়া বেড়ায়;
উপরে নয়ন হেলি দেখিল আকাশে
আতসে মাতিয়া ঝিঁঝিঁ খেলায় বাতাসে;
মৃদু মৃদু ভুরু ভুরু রব শুনা যায়,
চখে ঝলমল লাগে;—আতসে ছায়ায়।
আবেশে অবশ হল রাখালের মন
না নড়ে চোয়াল তার, নিচল নয়ন।
ঝরণা ছাগিয়া বায়ু ঝর ঝর আসে,
নিথর করিল তারে শীতল বাতাসে।

তখন কাতরে রব করিল চাতক ;
নাড়িল চোয়াল গোপ, হইল চমক।
এক মুটি লয়ে ফের আর মুটি লয়,
চাতক ছাড়িছে গলা ;—থামিবার নয় ;
'ফটীক, ফটীক জল,' বলে বার বার,—
চাল ছোলা চিবাইতে হল তাহে ভার ;
তাড়াতাড়ি থাবা থাবা খেয়ে জলপান,
ঝরণায় মুখ ধুয়ে করে জল পান,—
চীত হয়ে তরুতলে শয়ন করিল ;
পরাণ ভরিয়ে রব শুনিতে লাগিল।
এক, দুই, তিন, চারি, আসি দলে দলে,
চীত হয়ে শুল সবে তরু-ছায়া-তলে ;
দূর হতে হানে তীর—'ফটীঈক জল,'
দুই কাণে পশি করে মগজ বিচল ;
দূরেতে কাহার মিতা ডাকে বুঝি কারে,
চেনা গলা বটে, তবু চিনিবারে নারে ;
তা না; মরা মানুষেতে (যেন) কাহারেও ডাকে,
মানুষ মরিয়া কি গা, আকাশেতে থাকে ?
জটা বলি ডাকিল না ? 'জটীই দে জল,'
জটীর নয়ন দুটি করে ছল ছল ;

হয় ত ঠাকুর বাবা জল চাহিয়াছে ;
তবে কি আজিও বুড়া আকাশেতে আছে ?
আবার চলিল তীর—'তটীরে—যুগল,'
পুন শুন অই—'তোরা—দিবি রে ঐ জল ?'
উঠিয়া বসিয়া সবে চারিদিকে চায়,—
ঝোপের পাশেতে দেখে পাহাড়ির গায়,
শুইয়াছে যত গাভী শীতল ছায়ায়,
উগারি চিবান ঘাস আবার চিবায় ;
শপি শপি করি লেজ ধীরেতে হেলায়,
দুই বার নাড়ে মুখ, খানিক ঘুমায়।
'দিবীঈরে জল' পুন করিল আকুল,
জলের ঝরণা পানে চাহে গোপ-কুল।
যে খাদে পড়িয়া জল উপচিয়া যায়,
তাহার তীরেতে যত বাছুর দাঁড়ায় ;
মুখ গুলি বাড়াইয়া যাই দাঁড়াইল,
শাদা রাঙা ছবি বুঝি দেখিতে পাইল ;
চোখ হেলি, লেজ তুলি যতেক বাছুর,
উভরড়ে যায় দৌড়ে অতিশয় দূর।
'রবীইই আয়' বলি ডাকিল সুবল,
আকাশে পুছিল পাখী 'দিবিইরে জল ?'

লাঠি লয়ে, ধেয়ে গিযে, ফিরাল বাছুর,
পাখীরে ডাকিয়া তবে ছাড়ি দিল স্বর ;—

গান।

"ওরে আকাশের পাখী—কেন চাস্ জল ?
আশে পাশে জলধর (তোর) করে ঢল ঢল ;
শুনিয়াছি তুই নব- ঘন বারি বিনা,
আর কোন বারি তুই পান করিবি না ;
তবে কেন বার বার চাস্ তুই জল ?
হিয়াতে বাজে রে, হই পরাণে বিকল ;
মরা মানুষের কথা মনে পড়ে পাখী,
বিঁধ না হৃদয়ে আর বার বার ডাকি ;
তোর কি জলের দুখ ও ফটীক জল !
আশে পাশে জলধর (তোর) করে ঢল ঢল।"

পাহাড়ির ঢালু গায়ে চরে গাভী পাল ;
ভাগাভাগি দুই দল হইল রাখাল।
একদল কাছে থাকি, দেখিবে গোধন,
পাহাড়ে বেড়াতে চলে আর কয় জন।
হাতেতে মারিয়া তালি দৌড়িল উধাও,
আঁকা বাঁকা পথ ধরি করিছে চড়াও ;

ছোট ছোট ঝোপ গুলি ডিঙি ডিঙি যায়,
চোখ বুজি শশ-শিশু ঝোপেতে লুকায় ;
দৌড়িতে দৌড়িতে পদ অবশ হইল,
সমুখের গোপ যুবা হঠাৎ থামিল ;
একে একে সবে আসি দাঁড়ায় তখন,
ফিরিয়া দেখিল হোথা চরিছে গোধন ;
ছাতিম ছায়ায় আছে কয় জন বসি,
ঝরণার ধারে আছে—'হলা', 'রাকা' 'শশী' ;
'হলারে' বলিয়া ডাক ছাড়িল যুগল,
চাহিয়া দেখিল হেথা রাখালের দল।
সমুখে পাষাণ-বর, মাথায় টোপর,
বিশাল কঠিন দেহ—ভূধর শিখর ;
যুগ যুগ শত আছে, সমভাবে খাড়া,
নাহি নাড়ে শির, নাহি দেয় দেহ ঝাড়া ;
অকাতরে জানু পাতি বসি আছে বীর,
দেবতার দিকে মুখ অভয় শরীর ;
বরষার কালে কত নব-জলধরে,
আশে পাশে ঘুরে বুলে অনুরাগ-ভরে ;
চুপি চুপি ঝোপে ঝাপে লুকাইয়া রয়,
অভিলাস—পাহাড়ের সনে কথা কয় ;

কাণের কুহরে তার মৃদু মৃদু বলে,
ভিজায়ে ভিজায়ে হৃদি ধীরি ধীরি চলে,
তাতে কি পাহাড় ভুলে ? যোগে নিমগন,
নিসাড় নিচল ভাবে, করযে যাপন ;
গর গর করে মেঘ, নয়ন রাঙায়,
চৌদিকে নিকলে আলো, তড়িত খেলায় ;
বাজ বরিষণ করে বীরের মাথায়,
না নড়ে ভূধর-বর, নাহি দেয় সায়।
গরজি বরষি মেঘ, চলি যায় দূরে,
আশা নাহি ছাড়ে তবু পুন আসে ঘুরে,
পীড়নে নড়ে না শৈল, মরমে বিচল,
উছলিয়া উঠে হৃদি—ফুয়ারার জল।
ধবল শীতল জল উঠে গুঁড়ি গুঁড়ি,
ঝামরি ছাতার মত পড়ে সুঁড়ি সুঁড়ি।
তাহার নীচেতে গিয়া দাঁড়ায় রাখাল,
মাথায় ঘেরিয়া পড়ে মুকুতার জাল।
বারির কণাতে মিশি রবির কিরণ,
মনোহর রামধনু দেয় দরশন।
পিয়িল শীতল জল, ধুয়িল শরীর,
দেখিতে দেখিতে সবে চলে ধীরি ধীর।

শিয়াকুল ঝোপে পাখী   বাসা করিয়াছে ;
ছানাগুলি বুকে ঢাকি   গোপনেতে আছে।
রাখালের চোখে চোখ   যেমন হইল,
আকুল হইয়া পাখী   সরিয়া বসিল।
ছানাগুলি চিঁচি চিঁচি   করিয়া চেঁচায়,
ঘাড় তুলি চারিদিকে   কাতরে তাকায়।
না ছুঁইল ছানাগুলি   রাখাল মায়ায়,
ধীরে ধীরে গুটি গুটি   আর দিকে যায়।
নারাঙ্গী নেবুর তরু   ঘিরেছে লতায়,
শাখা পাতা কিছু তার   নাহি দেখা যায়।
সুগোল সবুজ ঘোর   ছাপর মতন,
মনোহর, সুকৌশল,—দেখায় কেমন।
মাঝে মাঝে সুণ্ডা সুণ্ডা   লতা উঠিয়াছে,
মুখে মুখে চুমি তারা   বিভোরেতে আছে।
পবন আসিয়া ধীরে   করে অনুযোগ,
দুটি দুটি মাথা নাড়ে,   নাহি ভাঙে যোগ।
ছোট ছোট শাদা ফুল   লাগান ছাপরে,
পাতার ভিতর থাকি   মিটি মিটি করে।
থোলো থোলো ফুটা ফুল   কিনারায় ঝুলে,
ভোমরা মৌমাছি বসে,—থক থক দুলে।

সবুজ ছাপর শোভা না হরে রাখাল,
দূর হতে ফুল ভরা লয় লতা জাল।
মাথায় জড়াল লতা, কাণে দিল ফুল,
সরস মানসে ফিরে, হরষ অতুল।
একে একে এলো সবে, গাভী যথা চরে;
ফুল লয়ে কাড়াকাড়ি সকলেই করে।
লাফালাফি হাতাহাতি খানিক হইল,
মিটিল লড়াই বাই সকলে থামিল।

আকাশের পথে নামে দেব-দিবাকর,
অতীত হয়েছে দিবা তৃতীয় পহর।
আধ পোয়া বেলা আছে, বলিল রাখাল,
যতনেতে জড় করে যতেক গোপাল।
'আম্বাআ' বলিয়া গাভী দিল যাই সাড়া,
দূরেতে বাছুর চাহে করে কাণ খাড়া।
'আহ মা আ' রবে গাভী ডাকিল আবার,
লেজ নাড়ি, মাথা ঝাড়ি, পাশে আসে তার।
রাঙা, কালী, ধলী, গাভী জুটিল আসিয়া,
পাহাড়ার ঢালু হতে চলিছে নামিয়া।
আগু পিছু দুই ধারে রহিল রাখাল,
সারি দিয়া মাঝে মাঝে চলিল গোপাল।

গোচারণ মাঠে গাভী আসিছে ফিরিয়া,
যতেক কৃষক যুবা চলে বাড়ি নিয়া;
আগে পাছে দুই ধারে চলিছে রাখাল;
সারি দিয়া থাকে থাকে, আসে গাভী পাল।
এস ভাই, চল যাই, ওই বটতলে,
দূরেতে থাকিয়া শোভা দেখিব সকলে।
সমুখেতে শৈল মালা—আকাশের গায়,
আবার ঢাকিয়া বুঝি ফেলিছে ধূঁয়ায়;
সরোবর ঢাকি আছে, কলমী, কমল;
সুধার সমীর করে বকুলে বিচল;
সারা কাল খাড়া আছে পুরাণ দেউল,
জীবনের সাথী তার,—হেলান তেঁতুল;
বেউড় বাঁশের ঝাড় করে কট্ কট্,
জট গাড়ি গট হয়ে বসি আছে বট;
ও দিকে গহন বন, নীরব, বিশাল;
শালতরু যোগ সাধে, পাহরায় তাল।
তেমনি শামল মাঠ, মাঝে গাভীদল,
তেমনি সবুজে ঢালা, করে ঢল ঢল;
সেই ত অসীম নীল মাথার উপর,
বহে বায়ু, চলে চীল, ঝরে রবিকর;

শোভার সকলি আছে, শোভাও ত আছে,
তবে কেন নিরখিয়া মন নাহি নাচে?
এখন আর ত নাই নাচনিয়া কাল,
অনেক বিভেদ আছে, সকাল, বিকাল।
সকালে নাচিয়া উঠে সকলের মন,
বিকালে মনের গতি মৃদুল দোলন;
তখন হাসেন ভানু উঠ্‌তি বয়েস,
অরুণের শরীরেতে তরুণের বেশ;
কমলে শুকায়ে দেন শিশিরের জল,
মাঠেতে মাখান রঙ্ ঈষৎ পীতল;
তরুরে শিরোপা দেন মরকত তাজ,
জগতে জাগায়ে দেন সাধিবারে কাজ;
উষার তপন সেই আশার আধার,
বিকালের রবি ছবি বিপরীত তার।
সকালের উষাপতি, মাঝের তপন,
সাঁঝের ভয়েতে এবে বিচলিত হন;
গড়াইয়া পড়ে ভানু থির নাহি রয়,
গেলে রে বয়স কাল হেন দশা হয়।
যে আলোকে পুলকিত হয়েছিল লোক,
ভুলেছিল হৃদয়ের গুরুতর শোক;

খরতর হলে যাহা সহ্য নাহি যায়,
অভিভূত ছিল জীব দুপর বেলায় ;
এখন আলোক আছে,—আভা তাহে নাই,
রোদ যেন ভাঙা ভাঙা করে সাঁই সাঁই।
তখন তপন-কর ঝলসে, ঝলকে,
তর তর সরে এবে পলকে পলকে ;
বড় লোক হীন-মানে কারো নাহি লাভ,
তপন পতনে হের জগতের ভাব।
মলিনী কমল-মণি, মুদিছে নয়ন,
হু হু হু হুতাশ ছাড়ে দুখে সমীরণ।
কাঁদে গাছ, ঝরে পাতা, কুসুম শুকায়,
দুলিয়া দুলিয়া লতা মরম জানায় ;
তেঁতুল, বাবলা, বক, জড় সড় হয়,
হিয়ায় লেগেছে আসি আঁধারের ভয়।
মাঠেতে সবুজ লীলা ভরপূর ছিল,
পাতলা হলুদে এবে শরীর ঢাকিল ;
বুড়ুটে বুড়ুটে রঙ—ঘোলা ঘোলা মত,
জলুস, তরাস নাই, আভা নাই তত ;
নদগদ নড়ে গাভী, ধায় না বাছুর,
অতি ধীরে লেজ নাড়ে, নীরবেতে খুর ;

দৈয়াল রসাল রাগে, না করে বিকল,
হিয়ায় না বিঁধে তীর ‘ফটীঙ্গীক জল,’
এখন পাপিয়া স্বর বিমানেতে ভাসে,
‘উহু উহু সব্ গেলো,’ রব কাণে আসে।
সরলা কৃষক বালা খাটে সারাদিন,
না জানে বিলাস ভোগ, লালস সৌখীন;
বিকালে বিরাম পায় গৃহ কাজ হ’তে,
কাঁখেতে কলস লয়ে . আসে সেই পথে;
পুরাণ দীঘির পাড়ে সেই ভাঙা ঘাট,
সারি সারি বসে সবে নাহি জানে ঠাট;
দিনের দুখের কথা কহিতে লাগিল,
বালিকার মাঝে যারা পতিহীনা ছিল,—
না কহে অধিক কথা, না নাড়ে নয়ন,
ডুবিছে তপন দেব দেখে এক মন।
ভাঙা ঘাটে; রবি পাটে; দেখিল আঁধার,
ভাঙা কপালের কথা মনে হল তার;
উপরে দেবতা পানে দেখিল চাহিয়া,
‘উহু উহু সব্ গেল,’ বলিল পাপিয়া;
চখে কি পড়িল বলি . ঝাঁপিল আঁচল,
নামিল · কাঁপিল তাহে সরোবর জল।

ছাড়ায়ে আধেক মাঠ আসিছে রাখাল,
দেহে মনে বল নাই, লেগেছে বিকাল।
তখন শুনেছ গীত "(তোরা) যাবি যদি আয়,
এবে সে সাহস নাই, শুন গীত গায় ;—

গান।

—'যে যাবার সে যাউক,' পূর্ব্বীতে বলে,
'আমি ত যাব না কভু যমুনারি জলে ,'
"যমুনার জলে আমি ছায়া দেখিয়াছি,
সে অবধি যমুনার কূল ছাড়িয়াছি ;
ছায়ার মায়ার বশে হই আন-মনা,
যে যাবে সে যা'ক জলে আমি ত যাব না ;

সম্পূর্ণ।